

তৃতীয় অধ্যায়

মানসিক স্বাস্থ্য ও অবসাদ

মানসিক স্বাস্থ্য ও অবসাদ সম্পর্কে আলোচনার আগে স্বাস্থ্য বলতে আমরা কী বুঝি তা জানা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য বলতে শারীরিক সুস্থতা বা শরীরের নীরোগ অবস্থাকে বুঝি। ব্যাপক অর্থে শারীরিক সুস্থতার সাথে মানসিক সুস্থতারও প্রয়োজন। মানসিক সুস্থতা শারীরিক সুস্থতার উপর নির্ভরশীল। যেকোনো কাজে আমরা নিযুক্ত থাকি না কেন শরীর সুস্থ না থাকলে কিছুই ভালো লাগে না, কাজে উৎসাহ থাকে না, কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। মানুষের চাহিদা অনুযায়ী পরিবেশের সাথে সঙ্গতি বিধানের মাধ্যমে মানসিক সুস্থতা বজায় থাকে। অতএব, যে ব্যক্তি নিজের চাহিদা ও পরিবেশের সাথে সফলভাবে সঙ্গতি বিধান করতে পারে, সেই মানসিক দিক দিয়ে সুস্থ। একজন মানুষের ব্যক্তিসত্তার সাথে সামঞ্জস্যমূলক শারীরিক ও মানসিক ত্রিস্নাক্ষাপের ঐ ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য হিসেবে অভিহিত করা যায়। অতিরিক্ত কাজ বা পরিশ্রমের চাপে একজন সাধারণ মানুষ বা একজন খেলোয়াড়ের কর্মক্ষমতা সাময়িকভাবে হ্রাস পায়। আবার দীর্ঘক্ষণ একই কাজ করার ফলে সেই কাজের প্রতি মানুষের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন দেখা দেয়। ফলে ব্যক্তির কর্মক্ষমতার অবনতি হয়। ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক অবস্থার এই পরিবর্তনকেই ক্লান্তি বা অবসাদ বলা হয়।



মানসিকভাবে সুস্থ ছেলেমেয়ে

অবসাদগ্রস্ত ছেলেমেয়ে

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- স্বাস্থ্যবর জীবনের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মানসিক আচরণের ধারণা বর্ণনা করতে পারব।
- অবস্থানভেদে মানুষের আচরণের ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মানসিক অস্থিরতা দূর করার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অবসাদের ধারণা ও প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অবসাদগ্রস্ত হওয়ার কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অবসাদ দূরীকরণের উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- অবসাদগ্রস্ততা দূর করে সুস্থ জীবনযাপনে অভ্যস্ত হতে পারব।

পাঠ-১ : মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষাধীর জীবনে এর ভূমিকা—এই অধ্যায়ের শুরুতেই মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সাধারণভাবে মানসিক স্বাস্থ্য বলতে— “Full and harmonious functioning of the whole personality”-কে বোঝায়। খেলাধুলা যেমন আমাদের শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখে, তেমনিভাবে মানসিক স্বাস্থ্য আমাদের দেহ ও মনের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করে। দেহের কোনো অঙ্গের ক্রিয়া সঠিকভাবে না হলে যেমন দৈহিক অসুস্থতা দেখা দেয়, তেমনি মানসিক প্রক্রিয়া সঠিকভাবে না হলে মানসিক অসুস্থতার সৃষ্টি হয়। ক্রীড়াক্ষেত্রে শিক্ষাধীর জীবনে প্রতিযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এই মানসিক অসুস্থতা প্রত্যক্ষ করা যায়। খেলাধুলা শুধু শারীরিক কসরত নয়, এর সাথে জয়ের আনন্দ ও পরাজয়ের বেদনাও জড়িত থাকে। তবে যেহেতু একজন ক্রীড়াবিদ শারীরিকভাবে সুস্থ থাকে, সেজন্য তাকে মানসিকভাবেও সুস্থ থাকতে হয়। কারণ শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা একে অপরের পরিপূরক। একজন শিক্ষাধী কোনো খেলায় জয়লাভ করলে আনন্দিত হয়, পরবর্তীকালে আরও ভালো করার জন্য তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠে। আর তার এই সাফল্য ধরে রাখার জন্য সে প্রশিক্ষণের প্রতি আগ্রহী হয়ে বেশি বেশি সময় ব্যয় করে এবং পরিশ্রমী হয়। তবে এরূপ জয়ের ফলে তার মধ্যে নেতিবাচক মনোভাবও গড়ে উঠতে পারে। যেমন—প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস, নিজেকে বড় করে দেখা কিংবা অপরের দক্ষতাকে ছোট করে দেখার প্রবণতার সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং বিজয়ী খেলোয়াড়দের মানসিকতার ভালো বা খারাপ দু ধরনের ফলাফল আসতে পারে।

আবার পরাজিত হলে হতাশার সৃষ্টি, অন্যের উপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করতে পারে। অনেকে হতাশায় মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে খেলাধুলা ছেড়ে দিতে পারে। জয়-পরাজয়ের এই স্বাভাবিক ঘটনাকে সহজভাবে নিতে না পারলে মানসিক চাপের সৃষ্টি হয় এবং তার কর্মকাণ্ডে নানা রকম অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে ক্রীড়া শিক্ষক বা প্রশিক্ষকদের বিজয়ী বা বিজিত খেলোয়াড়দের সাথে একত্রে কাজ করে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য বা মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখার সর্বাঙ্গিক চেষ্টা করা প্রয়োজন।

কাজ-১ : শারীরিকভাবে সুস্থ থাকলে তা মনের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলে একটি দল ধারাবাহিকভাবে বোর্ডে লেখো। এবং দৈহিক অসুস্থতার কারণে মন ভালো থাকে না এর কারণগুলো আরেকটি দল বোর্ডে লেখো। অতঃপর আলোচনা করো।

কাজ-২ : খেলাধুলায় জয়ী বা পরাজিত হলে একজন খেলোয়াড়ের যে মানসিক প্রতিক্রিয়া হয় এবং কীভাবে তা একজন ক্রীড়াবিদকে প্রভাবিত করে—শিক্ষার্থী বাড়ি থেকে লিখে এনে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করো।

পাঠ-২ : মানসিক আচরণ, এর প্রকারভেদ এবং মানসিক অস্থিরতা দূরীকরণের উপায়—মানুষ জীবতাত্ত্বিকভাবে বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। এই ধাপগুলো হচ্ছে শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব। প্রতিটি ধাপে শারীরিক পরিবর্তনকালে প্রতিটি মানুষ একটি সুনির্দিষ্ট আচরণের ধরন দ্বারা প্রভাবিত হয়। এ ধরনের আচরণ ভৌত এবং রাসায়নিক উদ্দীপকের প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এছাড়া তাৎক্ষণিক

প্রতিক্রিয়া (Reflex action), সহজাত প্রতিক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত বা উদ্দীপিত হয়। অতঃপর জীবন যখন এগিয়ে চলে তখন আচরণের ধরনে জটিলতা দেখা দেয় এবং প্রকৃত শিক্ষা দ্বারা এ সকল জটিলতা মানুষ তার স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা, যুক্তি ও অভীষ্ট সাধনের ক্ষমতা দ্বারা সমাধান করতে সক্ষম হয়।

মানসিক আচরণের প্রকারভেদ : মানব প্রকৃতি বিশদভাবে জানতে গেলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয় এজন্য যে ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এক বিস্ময়কর বৈসাদৃশ্য পরিদৃশ্যমান। যেমন কেউ অতিমাত্রায় ক্রুটিবাজ আবার কেউ বিষাদগ্ৰস্ত, কেউ কৌতুকপ্রিয়, কেউ রাশভারী, কেউ প্রাণবন্ত, কেউ গম্ভীর, কেউ বুদ্ধিমান, কেউ বোকা, কেউ সতর্ক, কেউ দুঃসাহসী, কেউ অমায়িক, স্নেহপ্রবণ, কোমল, কেউ অমার্জিত রুঢ়, কঠোর—এভাবে দু'টি পরস্পরবিরোধী আচরণের অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় এবং তা খুবই বৈচিত্র্যময়। কোনো ব্যক্তির মধ্যে যখন এসব বৈশিষ্ট্য দেখা দেয় তখন আমরা তাকে ব্যক্তিস্বতন্ত্র বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য নামে অভিহিত করি। আর এই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা একজন ব্যক্তিকে আরেক ব্যক্তি থেকে আলাদা করা যায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এই বিভিন্নতার কারণ কী তা জানা প্রয়োজন। কেননা একই পরিবারের একই পরিবেশে সব সন্তান একই রকমের হয় না। তাদের আচরণের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ এজন্য শারীরিক গঠন কাঠামোকে দায়ী করেন। আবার কেউ বংশগতি কিংবা পরিবেশগত অবস্থাকে এর কারণ বলে মনে করেন।

মানসিক অস্থিরতা দূরীকরণের উপায় : স্বাস্থ্য বলতে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতাকে বোঝায়। শরীর ও মন একে অপরের পরিপূরক। মানসিক অশান্তি থাকলে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। মানসিক অসুস্থতা মানুষের জীবনে অনেক ব্যর্থতা ও দুর্গতির সৃষ্টি করতে পারে। মানসিক অসুস্থতার কারণে শিশু মনে মানসিক বিকৃতির সূত্রপাত হয়, মাতা-পিতা বা অভিভাবক এ বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করে শিশু প্রকৃতির যেকোনো অস্বাভাবিকতা দূর করতে যত্নবান হবেন।

মানসিক অবস্থা ও মানসিক স্বাস্থ্যবিধি মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের বিষয়। এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদির মধ্যে রয়েছে মনস্তত্ত্ব, মানসিক ব্যাধি, ভেষজ, প্রাণবিদ্যা, সমাজ বিজ্ঞান। শিশু মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা, মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিভিন্ন রকমের মানসিক বিকৃতি তথা অস্থিরতা, মানসিক বিকৃতি ও বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধের জন্য চেষ্টা করে। মানসিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে মানসিক ব্যাধি, বুদ্ধিবৃত্তির স্বল্পতা, স্নায়বিক মনোবিকার, অপরাধ প্রবণতা ইত্যাদি প্রধান। মানসিক অস্থিরতা দূরীকরণের তথা প্রতিরোধের জন্য সুশিক্ষা, শিশুর স্বাস্থ্যসম্মত লালনপালন, পরিচর্যা, উন্নত পারিবারিক পরিবেশ, মাতা-পিতা, অভিভাবকের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির প্রয়োজন। মানসিক আচরণের এই জটিল গতি প্রকৃতি ও অস্থিরতা দূরীকরণে ধৈর্যশীল আচরণ, সুশিক্ষা, শিশুবান্ধব পরিবেশ, পুষ্টি, পরিচর্যা, আনন্দময় জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুর সরবরাহ ব্যবস্থাপনা থাকা প্রয়োজন। এর ফলে আগামীতে এক সুস্থ জাতি গড়ে উঠবে যা সামগ্রিকভাবে সকলের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে।

কাজ-১ : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে পরস্পরবিরোধী আচরণ দেখতে পাওয়া যায় তা উল্লেখ করে শিক্ষার্থীরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করে এবং যুক্তি প্রদর্শন করে।

কাজ-২ : মানসিক অস্থিরতার ক্ষতিকারক দিক কী এবং মানসিক অস্থিরতা দূরীকরণের উপায় সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করে।

পাঠ-৩ : অবসাদ, শ্রেণিবিভাগ ও শিক্ষার্থীর উপর এর প্রভাব—দীর্ঘক্ষণ একই কাজ করার ফলে সেই কাজের প্রতি মানুষের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন দেখা দেয়। এ পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তির কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। মানসিক ও শারীরিক অবস্থার এ পরিবর্তনকেই ক্লান্তি বা অবসাদ বলা হয়। তাই অবসাদ বলতে কর্মশক্তির শিথিলতা বা কর্মশক্তির হ্রাস পাওয়াকে বোঝায়। কর্মক্ষমতা হ্রাসই হলো অবসাদের সর্বজনীন কারণ। মনোবিদগণ অবসাদের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। কেউ বলেছেন—‘কর্মক্ষমতা হ্রাসই হলো অবসাদ।’ কারোর মতে—‘কাজ করার জন্য কর্মক্ষমতার হ্রাসই হলো অবসাদ, তবে বিশ্লেষণধর্মী সংজ্ঞা হলো—‘এক নাগাড়ে কোনো কাজ করার দরুন শরীরে কর্মক্ষমতার যে অবনতি হয় তাকে অবসাদ বলা যেতে পারে।’

অবসাদের শ্রেণিবিভাগ : মনোবিদগণ অবসাদকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করেছেন— (ক) দৈহিক অবসাদ ও (খ) মানসিক অবসাদ।

ক. দৈহিক অবসাদ : খুব বেশি সময় ধরে দৈহিক পরিশ্রম করলে যে অবসাদ আসে তাকে দৈহিক অবসাদ বলে। এ অবসাদ দৈহিক পেশিঘটিত ও ইন্দ্রিয়গত। প্রত্যেক ব্যক্তির দৈহিক শ্রমের একটি সীমা আছে, এ সীমা অতিক্রম করলে অবসাদ দেখা দেয়। সাধারণ অবস্থায় কাজের সময় যেসব শারীরিক চাহিদা অনুভূত হয় তা দেহ নিজেই পূরণ করে নেয়। যেমন—দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার ফলে অতিরিক্ত অক্সিজেনের চাহিদা মেটানো যায়। আবার রক্তের চাপ ও হৃদস্পন্দন বেড়ে গেলে অতিরিক্ত শর্করা নিঃসৃত হয়। তবে কাজটি বেশি শ্রমসাধ্য হলে, ব্যক্তির সহনশীলতা কম হলে, অতিরিক্ত ঠান্ডা বা গরমে ব্যক্তির শারীরিক ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে অবসাদ দেখা দেয়।

খ. মানসিক অবসাদ : মানসিক কাজ অনেকক্ষণ ধরে করতে থাকলে মানসিক কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় এবং অবসাদ দেখা দেয়। যেমন—অনেক সময় ধরে এক নাগাড়ে অঙ্কন করতে থাকলে একটা পর্যায়ে অঙ্কন করার জন্য বিচারশক্তি, চিন্তাশক্তি ও নির্ভুল করার ক্ষমতা কমে থাকে। এই কমে থাকা অর্থাৎ পরিবর্তনের এই অবস্থাকে মানসিক অবসাদ বলে। এছাড়া ব্যক্তিগত পছন্দ, অপছন্দ, মানসিক অবস্থার তারতম্য, পরিবেশগত কারণেও অবসাদ আসতে পারে। তবে দৈহিক ও মানসিক কাজকে যেমন সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা যায় না, তেমনি দৈহিক অবসাদ ও মানসিক অবসাদকে আলাদা করা যায় না। অনেকক্ষণ দৈহিক পরিশ্রম করলে মানসিক অবসাদ আসতে পারে, তেমনি একটানা মানসিক কাজ করতে থাকলে দৈহিক অবসাদ আসে।

শিক্ষার্থীর উপর মানসিক অবসাদের প্রভাব : শিক্ষার্থী বলতে এখানে শারীরিক শিক্ষা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের বোঝানো হয়েছে। শারীরিক শিক্ষা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের যে দৈহিক অবসাদ আসে তা তাদের শারীরিক পরিশ্রমের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। তাদের শারীরিক পরিশ্রমের ফলে বিপুল পরিমাণ ঘাম নিঃসরণ, শারীরিক অঙ্গ-সঞ্চালন এবং একাগ্রতার উপর প্রভাব ফেলে। কিন্তু যখন তারা মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন যেসব প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায় তা নিম্নরূপ :

- ১। তাদের কর্মসূচি পালনকালে ভুল হতে থাকে।
- ২। তারা নিজেদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে।
- ৩। তাদের কাজের মধ্যে সমন্বয় থাকে না।
- ৪। তারা কাজের ছন্দ হারিয়ে ফেলে এবং ভুল সিদ্ধান্ত নেয়।
- ৫। তারা অমনোযোগী হয়ে পড়ে, কর্মসূচি বাস্তবায়নের কশাকৌশল সহজে বুঝতে পারে না।
- ৬। কাজের একাগ্রতা কমে যায় এবং তারা মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে।

কাজ-১ : অবসাদ কী এবং কী কারণে অবসাদের সৃষ্টি হয় তা শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে বোর্ডে লেখ এবং আলোচনা করো।

কাজ-২ : মানসিক অবসাদগ্রস্ত হলে মনের উপর যেসব প্রভাব পড়ে তার একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করো।

পাঠ-৪ : মানসিক অবসাদের কারণ ও তা দূরীকরণের উপায় : দৈহিক বা মানসিক অবসাদ, সামগ্রিক বা আংশিক যাই হোক না কেন তার পিছনে কতকগুলো কারণ রয়েছে। ইতঃপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি শারীরিক শিক্ষা কর্মসূচিজনিত শারীরিক চাপের কারণে সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে অবসাদ আসে। তবে আরও অনেক কারণে অবসাদ আসতে পারে। মনোবিদগণ অবসাদের কারণসমূহকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন— (১) দৈহিক কারণ, (২) মানসিক কারণ এবং (৩) পরিবেশগত কারণ। দৈহিক অবসাদের জন্য মাংসপেশিতে ল্যাকটিক এসিডের সৃষ্টি, দেহকোষের ক্ষয়, শরীর থেকে লবণ বের হয়ে যাওয়া, যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন ঘাটতি, অতিরিক্ত অঙ্গ সঞ্চালন প্রভৃতি কারণে হয়ে থাকে। এই পাঠে আমরা মানসিক অবসাদ নিয়ে আলোচনা করব। মানসিক অবসাদের কারণসমূহকে আমরা নিম্নবর্ণিত উপায়ে বিশ্লেষণ করতে পারি। যেমন—

- ১। মানসিক প্রস্তুতির অভাব : কোনো কাজ করার আগে সে সম্পর্কে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। কর্মসূচি সম্পর্কে পূর্ব ধারণা স্পষ্ট না থাকলে তাড়াতাড়ি মানসিক অবসাদ আসে।

২। কাজে অভ্যস্ত না হয়ে উঠা : কর্মসূচি নিয়মিতভাবে পালনকালে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে ঐ কর্মসূচিতে তাড়াতাড়ি অবসাদ আসে না। তাই অভ্যাসের অভাবের কারণে অনেক সময় অবসাদ দেখা দেয়।

৩। কর্মক্ষেত্রে প্রেষণা এবং কাজের প্রতি অনুরাগের অভাব : যেকোনো কাজের পিছনে প্রেষণা থাকলে একটানা কাজ করেও অনেক সময় অবসাদ আসে না। আবার যে কাজে প্রেষণা নেই, সেই কাজ তার কাছে বোঝাম্বরূপ। ঐ ধরনের চাপিয়ে দেওয়া কাজে সহজে মানসিক অবসাদ দেখা দেয়।

৪। মানসিক ইচ্ছার অভাব : কর্মসূচি বাস্তবায়নের শিক্ষার্থীর যদি অনীহা থাকে তাহলে সে দ্রুতই মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মানসিক ইচ্ছা প্রবল হলে অনেক সময় কঠিন কাজ হলেও তা করা সম্ভব হয়। তাই মানসিক ইচ্ছার অভাব অবসাদের একটি বিশেষ কারণ।

৫। পরিবেশগত কারণ : দৈহিক ও মানসিক কারণ ছাড়াও কিছু পরিবেশগত কারণেও অবসাদ আসতে পারে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ অর্থাৎ স্যাঁতসেঁতে, আলো-বাতাসের অভাব এমন পরিবেশ, খুব গরম, খুব ঠান্ডা বা গুমোট আবহাওয়া কোনো কাজের জন্য অনুকূল পরিবেশ নয়। এরূপ পরিবেশে সহজেই অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। অনুরূপভাবে পরিমিত আলো, বাতাস, প্রশস্ত জায়গা ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ না থাকলে অল্পতেই অবসাদ এসে ভর করে।

মানসিক অবসাদ দূরীকরণের উপায় : দৈহিক ও মানসিক শক্তি ক্ষয়ের ফলেই যেহেতু অবসাদের উদ্ভব হয়, তাই দেহ ও মনের সুস্থতা ও সক্রিয়তা আনয়নের মাধ্যমে অবসাদ দূর করা সম্ভব। মানসিক অবসাদ দূরীকরণের জন্য আমরা নিচের বিষয়গুলোর উপর গুরুত্বারোপ করতে পারি :

১। কর্মসূচির প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি : শিক্ষার্থীর যদি কর্মসূচির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, তাহলে তাড়াতাড়ি অবসাদ আসে না।

২। কর্মসূচির একঘেয়েমিতা পরিহার : বিরক্তিকর কর্মসূচির একঘেয়েমিতা শিক্ষার্থীকে অবসাদগ্রস্ত করে তোলে। অন্যদিকে কাজের ফাঁকে বিশ্রাম কর্মসূচিকে আনন্দপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময় করলে অবসাদ দূর করা যায়।

৩। প্রেষণা : কর্মসূচিতে প্রেষণা থাকলে শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে তা পালন করবে এবং শীঘ্র অবসাদ আসবে না।

৪। অতিরিক্ত চাপযুক্ত কর্মসূচি পরিহার : সাধারণ অতিরিক্ত কোনো কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষার্থীদেরকে চাপ দেওয়া যাবে না।

৫। বিশ্রাম ও ঘুম : দেহের ক্ষয়পূরণের জন্য পুষ্টিকর খাবারের প্রয়োজন। তেমনি অবসাদ দূর করার জন্য প্রয়োজন পরিমিত বিশ্রাম ও ঘুম। বিশ্রাম ও ঘুমের ফলে দেহ ও মস্তিষ্কের অবসাদ দূরীভূত হয় এবং পুনরায় নতুন উদ্যোগে কাজ করার স্পৃহা জন্মে।

কাজ-১ : মানসিক অবসাদের কারণসমূহের একটি তালিকা বাড়ির কাজ হিসেবে তৈরি করে এনে শ্রেণিকক্ষের বোর্ডে লেখে এবং দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করো।

কাজ-২ : মানসিক অবসাদ দূরীকরণের উপায়গুলো ধারাবাহিক লিখে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করো। শিক্ষার্থীরা এর উপর আলোচনা করো।

অনুশীলনী

১. অবসাদ কী?

ক. কর্মশক্তি হ্রাস

খ. শারীরিক দুর্বলতা

গ. কাজের প্রতি অনীহা

ঘ. স্নায়বিক দুর্বলতা

২. খেলায় পরাজয় সহজভাবে মেনে নিতে না পারলে—

i. মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়

ii. কর্মকাণ্ডে অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়

iii. নেতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শামীম ৮ম শ্রেণির ছাত্র। তার বাবা-মা দুজনেই চাকুরীজীবী। শামীমের বাড়ির পাশে মাঠ না থাকায় সে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে না। যতদূর পারে পড়াশোনা করে। বাকি সময় ঘরে একা বসে থাকে। এতে কিছুদিন পর সে বিষণ্ণ হয়ে পড়ে।

৩. শামীমের অসুস্থতার ধরনটি কী?

ক. দৈহিক

খ. মানসিক

গ. পারিবারিক

ঘ. সামাজিক

৪. শামীমের বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় হচ্ছে—

i. বিনোদনের ব্যবস্থা

ii. বন্ধুদের সাহচর্য

iii. খেলাধুলায় অংশগ্রহণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বাবার আকস্মিক মৃত্যুর পর নবম শ্রেণির মেধাবী ছাত্রী রিতুর উপর একমাত্র ভাইয়ের পড়ালেখার ও মায়ের চিকিৎসাসহ সংসারের সকল খরচ পরিচালনার দায়িত্ব পড়ে। ফলে সকাল বিকাল টিউশনি করে এবং বাসায় থেকে রাত জেগে দর্জির দোকানের কাপড় সেলাই করে সে অর্থ উপার্জন করে। বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষায় তার ফলাফল খারাপ হলে তার মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। এতে সে পড়ালেখা ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তার মা এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তাকে উৎসাহিত করায় সে আবার পড়ালেখায় ফিরে আসে।

ক. শ্রেয়ণা কী?

খ. শিশুমনে অস্বাভাবিকতার কারণ কী?

গ. রিতুর পরীক্ষার ফলাফল বিপর্যয়ের কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রিতুর মানসিক অবস্থা দূরীকরণে কোন বিষয়টি কাজ করেছে বলে তুমি মনে কর? যুক্তিসহ উপস্থাপন করো।

২. নিলীমা সারাদিন অঙ্কক করে। তার মা তাকে বাইরে ঘুরে আসতে বললেও সে যায় না। সন্ধ্যার দিকে নিলীমা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। যে অংক দিনে অল্প সময়ের মধ্যে করতে পেরেছিল, এখন সেটা করতে বেশি সময় লাগছে। এ বিষয়টি নিয়ে নিলীমা চিন্তিত। তার মা তাকে টেলিভিশন দেখতে বলে এবং কিছু সময় বিশ্রাম নিতে বলে।

ক. মানসিক অবসাদ কী?

খ. শরীর ও মন একে অপরের পরিপূরক-ব্যাখ্যা করো।

গ. নিলীমার রাতে অঙ্কক করতে দেরি হওয়ার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. নিলীমার এ অবস্থা থেকে উত্তরণে তার মায়ের কর্মকাণ্ডের যথার্থতা বিশ্লেষণ করো।